কেন সমাজতন্ত্র?

আলবার্ট আইনস্টাইন

[এই লেখাটি প্রথম ১৯৪৯ সালে Monthly Review ছাপা হয়]

অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিষয়ে অদক্ষ কারো কি সমাজতন্ত্র বিষয়ে ধারণার প্রকাশ করা উচিত? অনেকগুলি কারণে আমি মনে করি করা উচিত।

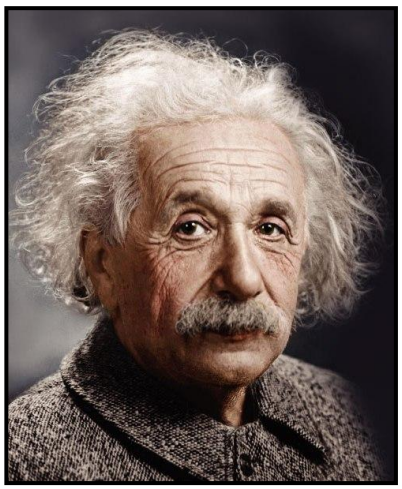

প্রথমত, প্রশ্নটিকে বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের দৃষ্টিকোন থেকে দেখা যাক। এটা মনে হতেই পারে যে, জোতির্বিদ্যা এবং অর্থনীতির মধ্যে পদ্ধতিগত কোনো পার্থক্য নেই : উভয় বিষয়ের বিজ্ঞানীরা সাধারণভাবে নির্দিষ্ট কিছু ঘটনার ব্যাখ্যার্থে গ্রহণযোগ্য কতগুলি সুত্র আবিষ্কারের চেষ্টা করেন, যাতে এই সব ঘটনাগুলির পারস্পরিক সম্বন্ধের ব্যাপারগুলি বোঝা যায়। কিন্তু আসলে এদের মধ্যে পদ্ধতিগত অনেক পার্থক্য বিদ্যমান। অর্থনীতির ক্ষেত্রে সাধারণ সূত্র আবিষ্কার অনেক কঠিন কারণ অর্থনৈতিক ঘটনাসমূহ প্রায়শই এত বেশি নিয়ামক দ্বারা প্রভাবিত হয় যে তাদেরকে আলাদাভাবে পরিমাপ করা যায় না। তাছাড়া মানব ইতিহাসের তথাকথিত সভ্যপর্যায়ের শুরু হতে আজ পর্যন্ত যে অভিজ্ঞতা সঞ্চিত হয়েছে, তা এমন কিছু নিয়ামকের দ্বারা নির্ধারিত ও প্রভাবিত যেগুলি কোনোভাবেই স্রেফ অর্থনৈতিক নয়। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, ইতিহাসের বেশিরভাগ জাতি তার অস্তিত্বের জন্য যুদ্ধজয়ের উপর ঋণী। বিজয়ী জনগোষ্ঠী আইনগত এবং অর্থনৈতিকভাবে বিজিত দেশের সুবিধাভোগকারী অবস্থানে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করেছে। নিজেদের জন্য সৃষ্টি করেছে ভূ-সম্পত্তির উপর একচেটিয়া অধিকার এবং স্ব-শ্রেণি হতে যাজকসম্প্রদায়কে নিয়োগ করেছে। এই যাজক সম্প্রদায় শিক্ষাব্যবস্থাকে কব্জা করার মাধ্যমে সামাজিক শ্রেণিভাগকে একটি স্থায়ী প্রতিষ্ঠানের রূপ দিয়েছে এবং এমন এক মূল্যবোধের প্রতিষ্ঠা করেছে, যা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে অসচেতনভাবেই মানুষের সামাজিক আচরণকে নিয়ন্ত্রণ করেছে।

কিন্তু ঐতিহাসিকভাবে আমরা বিগতকালের কথাই বলি, আমরা কোনোভাবেই মানব প্রবৃত্তির উন্নয়নের সেই স্তর থেকে বের হয়ে আসতে পারিনি যাকে থোর্স্টেইন ভেবে-ন 'the predatory phase' বলে আখ্যায়িত করেছেন। যত ধরণের অর্থনৈতিক ঘটনাসমূহ প্রত্যক্ষ হয় সবই এই কালের এবং এর থেকে প্রাপ্ত সূত্রসমূহ কালান্তরে গ্রহণযোগ্য নয়। যেহেতু সমাজতন্ত্রের আসল উদ্দেশ্য হলো মানব উন্নয়নের এই predatory phase কে সম্পূর্ণভাবে অতিক্রম করে এগিয়ে যাওয়া, তাই বর্তমানের অর্থনৈতিক বিজ্ঞান ভবিষ্যতের সমাজতান্ত্রিক সমাজকে খুব বেশি স্পষ্ট করতে পারে না।

দ্বিতীয়ত, সমাজতন্ত্র মূলত সামাজিক-নৈতিক একটি পরিণতির দিকে উদ্দিষ্ট। বিজ্ঞান কোনোভাবেই কোনো পরিণতির সৃষ্টি করে না, এমনকি ধীরে ধীরে সঞ্চারিতও করতে পারে না, বড়জোড় পরিণতিতে পৌঁছানোর জন্য উপাদানের যোগান দিতে পারে। কিন্তু এই পরিণতিসমূহ কল্পিত হয় সুউচ্চ নৈতিক আদর্শের কিছু ব্যাক্তির দ্বারা। আর যদি এসব অপরিহার্য ও প্রচণ্ড পরিণতিগুলি ইতোমধ্যে অর্জিত না হয়ে থাকে তবে, কিছু মানুষ এগুলোকে আত্মস্থ করে এবং সামনের দিকে নিয়ে যায়। এসব মানুষেরাই সমাজের সুস্থির বিবর্তনকে অর্ধসচেতনভাবে নিয়ন্ত্রণ করে।

এসব কারণেই আমাদেরকে খেয়াল রাখতে হবে যতে মানবিক সমস্যার ক্ষেত্রে বিজ্ঞান ও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিসমূহকে অতিশায়িত করা না হয় এবং এটা মনে করা উচিত নয় যে শুধু মাত্র সুদক্ষ লোকেরাই সামাজিক প্রতিষ্ঠানকে প্রভাবিতকারী বিষয়াদি নিয়ে বক্তব্য দেয়ার অধিকার রাখে।

অনেকদিন ধরেই অসংখ্য মানুষ এই দাবি করে আসছেন যে সমাজ একটা সংকটের মধ্যে দিয়ে পার হচ্ছে, সমাজের স্থিরতা বা ভারসাম্য প্রচণ্ডভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে গেছে। এটা এমন এক সময়ের বৈশিষ্ট্য যেখানে প্রত্যেক মানুষ তার সম্প্রদায় বা সংগঠনের প্রতি উদাসীন এবং ক্ষেত্র বিশেষে বৈরী হয়ে উঠে। আমার কথাকে বোঝানোর জন্য আমার ব্যাক্তিগত অভিজ্ঞতার উদাহরণ দেয়া যেতে পারে। সম্প্রতি আমি একজন বুদ্ধিমান ও বিদ্বান মানুষের সাথে আরেকটা যুদ্ধের সম্ভাবনা নিয়ে কথা বলছিলাম। আমার মত ছিলো যে, আরেকটা যুদ্ধ মানুষের অস্তিত্বকে মহাসংকটে ফেলে দেবে এবং এই মন্তব্য করেছিলাম যে শুধুমাত্র কোনো আন্তর্জাতিক মহাসংস্থাই পারে এই মহাবিপদ থেকে সুরক্ষা দিতে। তখন ঐ ব্যাক্তি বলে উঠলেন, 'মানবজাতির পরিণতি ধ্বংস, এটা থেকে আপনি এত বিপরীতে কেন?'

আমি নিশ্চিত যে মাত্র এক শতাব্দী বা তারও কম সময় আগে কেউ এ ধরণের কোনো মন্তব্যই করতে পারতো না। যারা নিজের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করতে ব্যর্থ এবং সফল হবার কোনো আশাই রাখেন না তারাই এ ধরণের মন্তব্য করেন। এর উৎস এমন এক ধরণের বিষাদপূর্ণ একাকীত্ব ও বিচ্ছিন্নতা, যাতে এ সময়ের বেশিরভাগ মানুষই ভুগছে। এর কারণ কি? এর থেকে মুক্তির কোনো উপায় কি আছে?

এ ধরণের প্রশ্ন উত্থাপন করা সহজ হলেও কোনো প্রকার নিশ্চয়তার সাথে এর উত্তর দেয়া কঠিন। যদিও আমি এটা সম্বন্ধে অবগত যে আমাদের চিন্তা ও চেষ্টাগুলো প্রায়শই অসংগতিপূর্ণ এবং অস্পষ্ট, তাদেরকে সহজ ও সাধারণ সূত্রের সাহায্যে প্রকাশ করা যায় না, তবুও আমি আমার যথাসাধ্য চেষ্টা করবো।

মানুষ হলো একই সাথে বিচ্ছিন্ন ও সামাজিক। বিচ্ছিন্নভাবে সে নিজের ও তার আশেপাশের সবার অস্তিত্বকে রক্ষা করার চেষ্টা করে, নিজের ব্যক্তিগত ইচ্ছাগুলোকে পূরণ করার চেষ্টা করে, তার সহজাত সামর্থের উন্নয়ন করে। আর সামাজিকভাবে সে তার আশেপাশের মানুষের স্বীকৃতি ও সম্প্রীতিলাভের চেষ্টা করে, তাদের সাথে আনন্দকে ভাগ করার চেষ্টা করে, তাদের দুঃখ লাঘবের চেষ্টা করে এবং তাদের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নের চেষ্টা করে। শুধুমাত্র এসব বিবিধ পারস্পরিক বিরোধপূর্ণ প্রচেষ্টার মধ্য দিয়েই মানুষের বিশেষ চরিত্র গড়ে উঠে। আর এসবের বিশেষ সন্নিবেশ নির্ধারিত করে একজন মানুষ তার অভ্যন্তরের ভারসাম্য কি মাত্রায় অর্জন করতে পারবে, সমাজের কল্যাণে কতটুকু অবদান রাখতে পারবে। এটা খুবই সম্ভব যে এই দুই পৃথক প্রচেষ্টার আপেক্ষিক শক্তি

জন্মসূত্রে নির্ধারিত হতে পারে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত যে ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটে তা বহুলাংশে তৈরি হয় মানুষ যে পরিবেশে বেড়ে উঠে তার দ্বারা, সে যে সমাজে বেড়ে উঠে তার কাঠামোর দ্বারা, ঐতিহ্যের দ্বারা এবং কিছু নির্দিষ্ট বিষয়ের মূল্যায়নের মাধ্যমে। 'সমাজ'এর বিমূর্ত ধারণাটি একজন ব্যক্তির কাছে তার সমসাময়িক ও পূর্বতন সবকিছুর সাথে তার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সম্পর্কের সমষ্টি। ব্যক্তি নিজে নিজে চিন্তা-চেষ্টা-অনুভব করতে পারে ও কাজ করতে পারে, কিন্তু তার শারীরিক, বৌদ্ধিক ও আবেগিক অস্তিত্বের জন্য সমাজের উপর এত বেশি নির্ভর করে যে, সামাজিক কাঠামোর বাইরে তাকে চিন্তা করা বা বোঝা সম্ভব নয়। সমাজই তাকে সারা জীবন ধরে খাদ্য,বস্ত্র, বাসস্থান, যন্ত্রপাতি, ভাষা, চিন্তার পদ্ধতি ও চিন্তার বিষয়ের যোগান দেয়; তার জীবন ধারণ সম্ভব হয় অতীত ও বর্তমানের নিযুত-লক্ষের শ্রমের দ্বারা, যারা এই 'সমাজ' নামের ছোট শব্দের পেছনে উহ্য।

ফলে এটা নিশ্চিত যে, সমাজের উপর নির্ভরতা প্রকৃতিতে পিঁপড়া ও মৌমাছির জন্য যেমন সত্য ও অলঙ্ঘ্য, তেমনি মানুষের ক্ষেত্রেও। পিঁপড়া ও মৌমাছির ক্ষেত্রে তাদের সমগ্র জীবন প্রক্রিয়াকে সুক্ষ্মতম ভাগ পর্যন্ত বিশ্লেষণ করা যায় কিছু নির্দিষ্ট, জন্মসূত্রে প্রাপ্ত সহজাত প্রবৃত্তির মাধ্যমে, আর মানুষের ক্ষেত্রে সামাজিক বিন্যাস আর পারস্পরিক সম্পর্কগুলি নির্দিষ্ট নয় এবং পরিবর্তনশীল। নতুন নতুন কল্পনার সৃষ্টিকারী মানুষের মস্তিষ্ক,ভাষিক যোগাযোগের আশীর্বাদের ফলে এমন উন্নয়নের সম্ভব হয়েছে যা জৈবিক প্রয়োজনের মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই। এই উন্নয়ন সুচিত হয় ঐতিহ্য, প্রতিষ্ঠান, সম্প্রদায়, ভাষা, বৈজ্ঞানিক ও প্রকৌশল অর্জনসমূহ এবং শিল্পকর্মসমূহের দ্বারা। এভাবে বোঝা যাচ্ছে মানুষ কীভাবে তার জীবনকে নিজের কর্মের দ্বারা প্রভাবিত করে এবং এই প্রক্রিয়ায় সচেতন চিন্তা-চাহিদার ভূমিকা রয়েছে।

মানুষ জন্মের সময় উত্তরাধিকারসূত্রে যে শরীরতন্ত্র লাভ করে, আমরা একে অবশ্যই অপরিবর্তনীয় ধরে নেবো, এমনকি বিভিন্ন জৈবিক তাড়নাসমূহ যা মনুষ্য প্রজাতির বৈশিষ্ট্য। সেই সাথে তার জীবদ্দশায় সে লাভ করে মননতন্ত্র, যা সে আয়ত্ত করে সমাজের সাথে তার যোগাযোগ ও অন্য ধরণের প্রভাবের মাধ্যমে। এই মননই সময়ের সাথে পরিবর্তিত হয় এবং অনেকাংশে সমাজের সাথে ব্যক্তির সম্পর্ককে নির্ধারণ করে।

(বাকি অংশ আগামী সংখ্যায়)